

দ্বিতীয় অধ্যায়

শারীরিক সক্ষমতা

শারীরিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হলো শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করা। তাই শারীরিক সক্ষমতার বৈশিষ্ট্য, খেলাধুলার সাথে এর সম্পর্ক, শারীরিক সক্ষমতার মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। ব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা কীভাবে অর্জন করা যায়, লিঙ্গভেদে ব্যায়ামের ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারবে। শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, দম, গতি, ক্ষিপ্ৰতা ও নমনীয়তার গুরুত্ব এবং কোন খেলায় কোনটির ভূমিকা বেশি তা জানতে পারবে। শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে সক্ষম হবে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- দৈহিক সুস্থতার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়ামের ইতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে বয়স ও লিঙ্গভেদে কোন খেলায় কোন কোন ব্যায়াম উপযোগী তা বর্ণনা ও অনুশীলন করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, গতি, দম, ক্ষিপ্ৰতা ও নমনীয়তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, গতি, দম, ক্ষিপ্ৰতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধির ব্যায়াম সঠিক নিয়মে করতে পারব।

পাঠ-১ : শারীরিক সক্ষমতা ও এর গুরুত্ব : সাধারণ অর্থে সক্ষমতা হলো কোনো কাজ করার সামর্থ্য। বৃহত্তর অর্থে সক্ষমতা বলতে জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষা করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ধারণ করার সামর্থ্যকে বোঝায়। এর মধ্যে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দিকের সামর্থ্য অন্তর্ভুক্ত। তাই মনে করা হয় যে, সক্ষমতা একটি সামগ্রিক ধারণা। সক্ষমব্যক্তি শারীরিক সুস্থতার সাথে সাথে মানসিক সুস্থতা, আবেগীয় ভারসাম্য ও

সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সমর্থ হন। শারীরিক সক্ষমতার এই সামগ্রিক ধারণা ব্যাখ্যা করার জন্য AAHPER (American Association of Health, Physical Education and Recreation) নামক স্পোর্টস জার্নালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ক. বংশগতি অনুযায়ী শারীরিক স্বাস্থ্য।

খ. দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং বিপদকালীন অবস্থায় প্রয়োজনীয় শক্তি, দম, সমন্বয় ক্ষমতা ও কৌশল।

গ. প্রাথমিক জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের প্রতি যথাযথ মনোযোগ ও মূল্যবোধ।

ঘ. আধুনিক জীবনযাত্রার জটিলতা থেকে চাপমুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজন আবেগিক ভারসাম্য।

ঙ. দলের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং সমাজ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক চেতনা।

চ. চলার পথে উদ্ভূত সমস্যাবলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বৃদ্ধি ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা।

ছ. গণতান্ত্রিক দেশের দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য পালনের জন্য আবশ্যিক নৈতিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা।

সুতরাং সক্ষমতা বলতে ব্যক্তির সামগ্রিক সামর্থ্যকে বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সক্ষমতা মানুষের ব্যক্তি সামগ্রিকতা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সামগ্রিক সক্ষমতার বিভিন্ন দিকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাস্তব, প্রয়োজনীয় এবং প্রাথমিক দিক হলো শারীরিক সক্ষমতা। সক্ষমতার এই দিক জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আবশ্যিক। শারীরিক সক্ষমতা হলো শারীরিক কাজকর্ম করার সামর্থ্য। সুতরাং দৈহিক কাজের ভিত্তি অনুসারে শারীরিক সক্ষমতারও স্বরূপ বদলায়। সেজন্য দৈনন্দিন জীবনের হাঁটা, চলা, বসা ও অন্যান্য কাজের জন্য শারীরিক সক্ষমতা এবং একজন খেলোয়াড়ের শারীরিক সক্ষমতা এক নয়। কাজের ধরনের উপর শারীরিক সক্ষমতার ধরনও ভিন্ন। শারীরিক সক্ষমতার সংজ্ঞা হিসেবে ক্লার্ক বলেছেন- “The ability to carry out everyday task with vigour and alertness, without undue fatigue and with ample energy to enjoy leisure time pursuits and to meet unforeseen emergencies”. ক্লার্ক না হয়ে শক্তি ও সচেতনতার সাথে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করা, আনন্দ ও উৎসাহের সাথে অবসর সময় কাটানো এবং সংকট মোকাবিলার সামর্থ্য হলো শারীরিক সক্ষমতা। অনেকের মতে যন্ত্রনির্ভর আধুনিক জীবনে কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাওয়ায় শারীরিক সক্ষমতার উপরোক্ত সংজ্ঞা বর্তমানে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়। শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজনীয় দিকগুলো হলো শারীরবৃত্তীয় অঙ্গ ও তন্ত্রসমূহের কার্যক্ষমতা, নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য ইত্যাদি।

শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব : একজন শিক্ষার্থী/ব্যক্তি শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করলে দৈনন্দিন জীবনের সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে। যেমন-

১. যেকোনো শারীরিক কার্যক্রম অনায়াসে করতে পারবে।

২. দৈব-দুর্ঘটনা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে।

৩. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৪. শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করলে মন ভালো থাকে ফলে লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে পারবে।

৫. যেকোনো ধরনের খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জন করতে পারবে।

কাজ-১ : শারীরিক সক্ষমতা বলতে কী বুঝ? তা পোস্টার পেপারে লিখে দেখাও।

কাজ-২ : দলে ভাগ হয়ে শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব আলোচনা করো।

পাঠ-২ : ক্রীড়াভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়াম : ক্রীড়াভেদে ব্যায়ামের ভিন্নতা রয়েছে। সব খেলার জন্য একই ধরনের ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না। কোনো খেলায় হাতের শক্তির যেমন প্রয়োজন তেমনি কোনো খেলায় পায়ে শক্তির বেশি প্রয়োজন হয়। সংশ্লিষ্ট খেলার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করা হলে ঐ খেলায় ভালো ফল আশা করা যায়। যেমন-

ফুটবল : ফুটবল খেলায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় শক্তি, দম ও ক্ষিপ্ততা। সুতরাং যারা ফুটবল খেলবে তাদেরকে শক্তি ও দম বাড়ানোর ব্যায়াম বেশি করে করতে হবে।

সাঁতার : যারা সাঁতার তাদের হাত, পায়ে শক্তি ও দম বাড়ানোর ব্যায়াম বেশি করে করতে হবে।

বাস্কেটবল : যে সমস্ত শিক্ষার্থী বা খেলোয়াড় বাস্কেটবল খেলায় অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে দম, ক্ষিপ্ততা ও পায়ে শক্তি বাড়ানোর ব্যায়ামের উপর জোর দিতে হবে।

ভলিবল : ভলিবল খেলোয়াড়দের হাতের শক্তি একটু ভালো হলে ম্যাশ করতে সুবিধে হয়। সেজন্য হাতের শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম করা উচিত।

হ্যান্ডবল : হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের হাত, পা ও ক্ষিপ্ততার বেশি প্রয়োজন হয়। সেজন্য হাত ও পায়ে শক্তিবৃদ্ধির ব্যায়াম এবং ক্ষিপ্ততা বাড়ানোর ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

কাবাডি : কাবাডি খেলাকে আমরা বলি শক্তির খেলা। শুধু শক্তি হলেই কোনো খেলায় ভালো করা যায় না। কাবাডি খেলায় হাতের শক্তি ও ক্ষিপ্ততার বেশি প্রয়োজন। বয়সানুযায়ী কোন খেলায় কী ধরনের শারীরিক সক্ষমতা প্রয়োজন, নিচে একটি ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হলো :

খেলা	দম	ক্ষিপ্ততা	শক্তি			কত বয়স পর্যন্ত
			পা	তলপেট	হাত ও বাহু	
ফুটবল	বে	বে	বে	ম	বে	৩৫ বছর পর্যন্ত
ক্রিকেট	ম	ম	বে	ম	বে	৪০ বছর পর্যন্ত
হ্যান্ডবল	ম	বে	বে	ম	বে	সব বয়সের জন্য
ভলিবল	ক	ম	ম	ম	বে	৩০ বছর পর্যন্ত
হকি	বে	বে	বে	ম	বে	৩০ বছর পর্যন্ত
বাস্কেটবল	বে	বে	বে	ক	ক	৩০ বছর পর্যন্ত
সাঁতার	বে	ম	বে	ম	বে	৩০ বছর পর্যন্ত
স্প্রিন্ট	ম	বে	বে	ম	বে	৪০ বছর পর্যন্ত
দূরপাল্লার দৌড়	বে	ক	বে	ম	ম	৪০ বছর পর্যন্ত
কাবাডি	ম	বে	বে	ম	বে	৩৫ বছর পর্যন্ত
ব্যাডমিন্টন	বে	বে	বে	ম	ম	৪৫ বছর পর্যন্ত

বে= বেশি প্রয়োজন, ম= মধ্যম প্রয়োজন, ক= কম প্রয়োজন

কাজ-১ : একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের কী ধরনের শারীরিক যোগ্যতা থাকা দরকার তা বলো।

কাজ-২ : একজন স্প্রিন্টার ও একজন দূরপাল্লার দৌড়বিদের শারীরিক যোগ্যতার পার্থক্য লিখে বোর্ডে উপস্থাপন করো।

পাঠ-৩ : বয়স ও লিঙ্গভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়াম

বয়সভেদে : শারীরিক শিক্ষা সকল বয়সের লোকদের জন্য প্রযোজ্য। তবে বয়সভেদে শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম ভিন্নতর হয়ে থাকে। শিশু ব্যায়ামই নয়, খাবার, পছন্দ-অপছন্দ, শারীরিক ক্ষমতা ইত্যাদিও ভিন্নতর হয়। যেমন-শিশুদের শারীরিক সক্ষমতা বড়দের মতো নয়। তাই তাদের সক্ষমতা অর্জনের জন্য 'খেলার ছলে ব্যায়াম' এই কথা মাথায় রেখে ব্যায়াম তথা খেলাধুলা নির্বাচন করতে হবে। যেমন-ব্যাঙের মতো লাফাও, দৌড়ে ঐ দেয়াল ছুঁয়ে আস, কাকের মতো লাফাও বা অন্য কোনো চিণ্ড বিনোদনমূলক খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করাতে হবে। কিশোরদের জন্য কিছুটা নিয়মমাফিক ব্যায়াম ও খেলাধুলা নির্বাচন করতে হবে। এক লাইনে দাঁড়ানো, হাত বা পায়ের ব্যায়াম করা, বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা, ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা এই জাতীয় ব্যায়াম বা খেলা নির্বাচন করে শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তবে শিশু ও কিশোরদের ভারোত্তোলন জাতীয় কোনো কঠিন ব্যায়াম করানো যাবে না। এতে শরীরের উন্নতির চেয়ে ক্ষতি হবে। যুবকদের জন্য সময় ও ব্যায়াম নির্বাচন করে নিয়মমাফিক অনুশীলন করাতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলার সঠিক কৌশল জানতে পারবে এবং ভবিষ্যতে খেলাধুলার ভিত গড়ে উঠবে। লক্ষ রাখতে হবে অতিরিক্ত ব্যায়ামের ফলে শিক্ষার্থীরা যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। কোনো অঙ্গের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট ব্যায়াম বাছাই করে অনুশীলন করতে হবে। এভাবে শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করাতে হবে। বয়স্কদের জন্য হালকা ব্যায়াম যেমন-হাঁটা, জগিং, আন্তে আন্তে দৌড়, এভাবে ব্যায়াম নির্বাচন করে শারীরিক সক্ষমতা ধরে রাখতে হবে।

লিঙ্গভেদে : শারীরিক শিক্ষা সকলের জন্য সমান হলেও বাস্তবে কতটুকু তা প্রয়োগ করা যায় এটাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। শারীরিক শিক্ষা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক হলেও শিশু বয়সে ছেলে ও মেয়েদের খেলাধুলা ও ব্যায়াম পৃথক করা যায় না। শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রেও তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। শিশুদের জন্য শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম তৈরির ক্ষেত্রে আনন্দদায়ক খেলাধুলা, অনুকরণমূলক হাঁটা, লাফ ও দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিশুদের শারীরিক গঠন ও শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম তৈরি করা উচিত, যাতে শিশু মনের বিকাশ সাধনও হয়। কিশোর বয়সে অর্থাৎ ৭-১২ বছর বয়সে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। মেয়েরা তখন ভারী কোনো খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে না। ছেলেরা দলগত খেলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বেশি তবে ব্যক্তিগত খেলাধুলায় ছেলেমেয়ে উভয়েই অংশগ্রহণ করে থাকে। যেমন-ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, দৌড় ইত্যাদি। এ সময় থেকেই ছেলেমেয়েদের শারীরিক সক্ষমতার জন্য শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি পৃথক করতে হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ কারণে তাদের কার্যক্রম ভিন্নতর হতে থাকে। ছেলেরা দলগত খেলার সাথে সাথে একক খেলা যথা-অ্যাথলেটিকস, সাঁতার ইত্যাদি খেলা পছন্দ করে। অধিকাংশ ছেলেরা সাহসিকতা ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে ছিধা করে না। মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের ফলে আচরণে সতর্কতা ও লজ্জাভাব দেখা যায়। সেজন্য শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম আলাদা হয়ে থাকে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিযোগিতা হয় যেমন-সাঁতার, অ্যাথলেটিকস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস প্রভৃতি ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে করা হয়। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শারীরিক শক্তি ও

সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকায় শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম ভিন্ন হয়। সুতরাং লিঙ্গভেদে শিশু পর্যায়ে পার্থক্য করা না গেলেও বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে।

কাজ-১ : বয়সভেদে শিশু ও কিশোরদের শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রমের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

কাজ-২ : বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম কেন পৃথক করা হয়—উপস্থান করো।

পাঠ-৪ : শারীরিক সক্ষমতায় ব্যায়ামের প্রভাব : শারীরিক সক্ষমতার জন্য ব্যায়াম অপরিহার্য। ব্যায়াম না করলে কখনো শারীরিক সক্ষমতা অর্জন সম্ভব নয়। সেজন্য সব বয়সের মানুষের নিয়ম মোতাবেক নির্দিষ্ট ব্যায়াম করা প্রয়োজন। ব্যায়ামের প্রভাবে শরীরের ভিতর বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হয় যা শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ব্যায়ামের প্রভাবে শরীরের ভিতর যে পরিবর্তন হয় তা এখানে তুলে ধরা হলো—

১. হৃৎপিণ্ডের (Heart) পেশি শক্তিশালী হয় : খেলাধুলা বা ব্যায়াম করলে শরীরের রক্ত চলাচল বেড়ে যায় ফলে হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে হৃৎপিণ্ডের পেশি শক্তিশালী ও নীরোগ হয়। এরূপ হৃৎপিণ্ডকে “অ্যাথলেটিক হার্ট” বলে।

২. হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালন করার ক্ষমতা বাড়ে : একজন সাধারণ মানুষের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিট ১৩০ মিলিলিটার রক্ত সঞ্চালন করে। খেলাধুলা বা ব্যায়াম করার সময় রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হৃৎপিণ্ডের সঞ্চালন করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। এতে হৃৎপিণ্ড সবল ও কর্মক্ষম হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৩. পালস রেট (Pulse rate) বৃদ্ধি পায় : একজন সাধারণ মানুষ পরিশ্রম করলে তার পালস রেট বেড়ে যায়। পুনরায় স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগে। ফলে ক্লান্তি সহজে দূর হয় না। অপরদিকে একজন ভালো খেলোয়াড় যখন খেলাধুলা বা ব্যায়াম করে তখন তার পালস রেট বেশি বাড়ে না এবং দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসে। ফলে তার ক্লান্তি তাড়াতাড়ি দূর হয়।

৪. রক্ত চলাচল বাড়ে : খেলাধুলা বা ব্যায়াম করলে শরীরের রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের চেয়ে খেলোয়াড়দের মাংসপেশি, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও সবল হয়।

৫. রক্ত কণিকা : রক্ত কণিকা তিন ধরনের থাকে—

ক. লোহিত কণিকা খ. শ্বেত কণিকা গ. অণুচক্রিকা

ক. লোহিত কণিকা : রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি থাকে। এক ঘন মিলিলিটার রক্তে পুরুষদের রক্তের ক্ষেত্রে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ এবং মহিলাদের রক্তে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোহিত কণিকা থাকে। এটি অস্থিমজ্জায় উৎপন্ন হয় ও ১২০ দিন পর গ্রীহায় বিনষ্ট হয়। ব্যায়াম করলে লোহিত কণিকার সংখ্যাও বেড়ে যায় ও বেশি দিন বাঁচে। এটি হিমোগ্লোবিনের সহায়তায় দেহের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. শ্বেত কণিকা : আমাদের শরীরে রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা অনেক কম থাকে। এক মিলিলিটার রক্তে ছয় থেকে আট হাজার শ্বেত কণিকা থাকে। এরা বর্ণহীন ও নিউক্লিয়াসযুক্ত। এরা সাধারণত ১২-১৩ দিন বেঁচে থাকে। ব্যায়াম করলে এরা বেশিদিন বাঁচে ও সংখ্যা বেড়ে যায়। শ্বেতকণিকা রক্তে প্রবেশকারী জীবাণুকে ঘিরে ধরে বিনষ্ট করে এবং দেহকে রক্ষা করে। ফলে শারীরিক সক্ষমতা মজবুত ও শক্তিশালী হয়।

গ. অণুচক্রিকা : অণুচক্রিকা দেখতে ডিম্বাকার ও বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট অনেকটা ডিসকের মতো দেখতে। দেহের বৃহদাকার কোষ ভেঙ্গে অণুচক্রিকা সৃষ্টি হয়। দেহের কোনো স্থানে ক্ষত হলে সেখানে ও মিনিটের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

৬. শ্বাসপ্রশ্বাস (Respiration) : খেলাধুলা ও ব্যায়াম করার সময় ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করতে হয়। ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ ও প্রশ্বাসের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যায়। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসের ফলে বুকের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শারীরিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

৭. মাংসপেশি (Muscle) : শরীরে বিভিন্ন ধরনের মাংসপেশি থাকে। খেলাধুলা ও ব্যায়ামের ফলে মাংসপেশি সংখ্যায় বাড়ে না তবে আকৃতিতে বড় হয়, টিস্যুগুলো মোটা ও শক্তিশালী হয়। ফলে শারীরিক ক্ষমতাও অনেক বেড়ে যায়। ব্যায়ামের ফলে শরীরের মাংসপেশিতে যে বিভিন্ন পরিবর্তন বা বৃদ্ধি ঘটে তা শারীরিক ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে।

কাজ-১ : ব্যায়ামের ফলে হৃৎপিণ্ডের যে পরিবর্তন ঘটে তা পোস্টার পেপারে লিখে দেয়ালে লাগাও।

কাজ-২ : ব্যায়ামের ফলে রক্তে লোহিত কণিকা ও গ্লেট কণিকার কী পরিবর্তন হয় তা বিশ্লেষণ করো।

পাঠ-৫ : শারীরিক ক্ষমতা অর্জনে গতি, শক্তি, দম, ক্ষিপ্ততা ও নমনীয়তা বৃদ্ধির ব্যায়াম : ব্যায়াম করার আগে প্রত্যেকের নিজ দেহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে এই জ্ঞান আরও জরুরি। প্রত্যেকেরই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকলে অঙ্গের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট ব্যায়াম বেছে অনুশীলন করা যায়। মাংসপেশির গতি সংকলনের জন্য পাঁচ ধরনের শারীরিক ক্ষমতার দ্বারা শরীরকে উপযুক্ত করে গঠন করা যায়। যেমন—

১. শক্তি ২. গতি ৩. দম ৪. ক্ষিপ্ততা ৫. নমনীয়তা

১. শক্তি (Strength) : শক্তি বলতে হাতের মাংসপেশির উন্নতির মাধ্যমে হাতের শক্তি বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। নিচে হাতের শক্তি বৃদ্ধি করার কয়েকটি ব্যায়াম উল্লেখ করা হলো—

ক. ডাম্বেল হাত দিয়ে ধরে উপরে উঠানো ও নামানো।

খ. চিত হয়ে শুয়ে ভার উপরে তোলা ও নামানো।

গ. মাটিতে দু হাত কাঁধ বরাবর ফাঁক রেখে পুশ আপ। আঙুলে আঙুল এক পা উপরের দিকে তুলে পুশ আপ।

ঘ. মেডিসিন বল ছোড়া।

ঙ. মান্টি জিমে বিভিন্ন প্রকার হাতের ব্যায়াম করা।

উল্লিখিত ব্যায়ামগুলো প্রশিক্ষকের নির্দেশে নিয়ম মারফিক করলে হাত ও কাঁধের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

২. গতি (Speed) : গতি বলতে দ্রুততা বোঝায়। যে যত বেশি দ্রুততার সাথে যেতে পারে তার গতি বেশি বলে ধরা হয়। গতি বৃদ্ধির জন্য পায়ের মাংসপেশির শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম করা প্রয়োজন। যেমন—

ক. চিত হয়ে শুয়ে পায়ের পাতার উপর ভার নিয়ে পা উপরে উঠানো করাতে হবে।

খ. জিমনেশিয়ামে পা দ্বারা লোহার ভারকে ঠেলে ভিতরে ও বাইরে নিতে হবে।

গ. ২৫ মিটার, ৫০ মিটার দৌড় বারবার অনুশীলন করতে হবে।

ঘ. ট্রেডমিলের উপর দাঁড়িয়ে দৌড় অনুশীলন করতে হবে।

ঙ. বালির মধ্যে কিছুক্ষণ দৌড়ালেও মাংসপেশি সবল হয়।

এভাবে অনুশীলন করলে পায়ের মাংসপেশি সবল ও বৃদ্ধি পায়। ফলে তার গতি বৃদ্ধি পাবে।

৩. দম (Stamina) : সব খেলার জন্য দম প্রয়োজন। তবে ফুটবল, লম্বা দূরত্বের দৌড়, ম্যারাথন, বাস্কেটবল এ খেলাগুলোতে দম সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। দম বাড়ানোর ব্যায়াম হলো—

ক. আন্তে আন্তে দৌড়, তবে বেশি সময় ধরে দৌড়াতে হবে।

খ. উঁচু-নিচু জায়গা দিয়ে বা অসমতল জায়গা দিয়ে দৌড়াতে হবে।

গ. প্রথম দিন ১ কিলোমিটার, ৩ দিন পর ১ $\frac{1}{2}$ কিলোমিটার, তার ৭ দিন পর ২ কিলোমিটার, এভাবে দূরত্ব বাড়িয়ে দৌড়াতে হবে।

৪. ক্ষিপ্ততা (Agility) : শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে অল্প জায়গার মধ্যে কে কত দ্রুততার সাথে কাজ করতে পারে তাকেই ক্ষিপ্ততা বলে।

ক. দ্রুত দৌড়ে যাওয়া ও বাঁশির সংকেতে থামা।

খ. ১০ মিটার দৌড় অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সাথে দৌড় দিয়ে দাগ ছুঁয়ে আসা ও যাওয়া। এভাবে সময় ধরে দৌড় অনুশীলন করতে হবে।

গ. ২০ মিটার দৌড়ের জন্য দুই মিনিট সময় নির্ধারণ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে কে কতবার দৌড়াতে পারে তা জেনে যে ভালো করেছে সে বিজয়ী হবে। এভাবে পায়ের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৫. নমনীয়তা (Flexibility) : শরীরের নমনীয়তা বৃদ্ধি করার জন্য এই শারীরিক ব্যায়ামগুলো করতে হবে, যেমন—

ক. একটি উঁচু বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে পা সোজা রেখে শরীর বাঁকিয়ে দু হাত কানের সাথে রেখে আন্তে আন্তে সামনের দিকে শরীর বাঁকাতে হবে। যার শরীর যত বেশি বাঁকা হবে তার নমনীয়তা তত বেশি।

খ. চিত হয়ে শুয়ে দুই কানের কাছে দুই হাত রেখে হাঁটু ভাঁজ করে শরীর উপরের দিকে তোলা ও নামানো। একে আর্চিং বলা হয়।

গ. মাটিতে বসে দু পা সামনে সোজা করে রেখে দু হাত কানের সাথে লাগিয়ে পায়ের আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করা।

কোনো শিক্ষার্থী যদি এই ৫টি গুণ অর্জন করতে পারে তাহলে তার শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, কাজে-কর্মে উৎসাহ ও পড়াশোনায় মন বসবে।

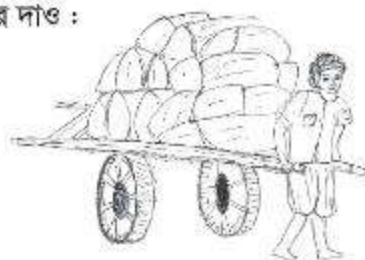
কাজ-১ : শক্তি বাড়ানোর ব্যায়ামগুলো পোস্টার পেপারে লিখে টাঙিয়ে দাও।

কাজ-২ : দম বাড়ানোর ব্যায়ামগুলো ধারাবাহিকভাবে বোর্ডে লিখে ব্যাখ্যা করো।

নিচের উদ্দীপকটি পর্যবেক্ষণ করো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৬ বছরের বালক রূপম



১৬ বছরের বালক সোহেল

চিত্রের মাধ্যমে জানা যায়, রূপমের পালস রেট স্বাভাবিক থাকলেও সোহেলের পালস রেট অস্বাভাবিক বেশি।

৬. রূপমের পালস রেট স্বাভাবিক থাকার কারণ কী?

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| ক. বয়স কম | খ. লেখাপড়া করা |
| গ. পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ | ঘ. খেলাধুলা করা |

৭. দু জনেই পরিশ্রম করা সত্ত্বেও সোহেল বেশি ক্লান্ত হয় কেন?

- | | |
|--|--|
| ক. সোহেলের রক্তে অণুচক্রিকা বৃদ্ধি পায় | খ. সোহেলের রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা কমে যায় |
| গ. সোহেলের রক্তে অণুচক্রিকা স্থিতিশীল থাকে | ঘ. শ্বেতকণিকা নিষ্ক্রিয় থাকে |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৯ম শ্রেণির আবির ও আরিফ দুই বন্ধু কাবাডি ও বাস্কেটবল খেলায় অংশগ্রহণ করে। আবির কাবাডিতে ভালো করলেও হাতের শক্তি কম থাকায় বাস্কেটবল খেলায় ভালো করতে পারেনি। অন্যদিকে আরিফ কাবাডি ও বাস্কেটবল উভয় খেলাতেই ভালো নৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

ক. শক্তি কী?

খ. বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম আলাদা কেন? বর্ণনা করো।

গ. আবির কীভাবে বাস্কেটবল খেলায় ভালো করতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. আবিরের হাতের শক্তির জোর বাড়ালেই কি সে আরিফের মতো বাস্কেটবল খেলায় ভালো করতে পারবে? বিশ্লেষণ করো।